৪

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শন

ভূমিকা: রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে সাধারণতঃ তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। এগুলো হল প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা। মধ্যযুগ আপন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। মধ্যযুগের সূচনাকাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে টিউটোনিক উপজাতিদের দ্বারা রোমান সাম্রাজ্যের সূচনাকাল থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব পর্যন্ত এ যুগ বিস্তৃত ছিল। হার্নশ একাদশ শতাব্দীর গ্রেগরীয় আন্দোলন থেকে প্রটেষ্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন পর্যন্ত মধ্যযুগের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে মধ্যযুগের নতুন ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা শ্রেণীর মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিবাদ দ্বারা এ যুগ তাৎপর্যমন্ডিত। অধ্যাপক ডানিং যথার্থই বলেছেন যে, মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইতিহাসের মূল বিষয় হচ্ছে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

আসুন আমরা মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তা শীর্ষক ইউনিটের পাঠগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১ : মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য;*
- *পাঠ-২ : সেন্ট অগাষ্টিন;*
- *পাঠ-৩ : টমাস একুইনাস ও*
- *পাঠ-৪: পাদুয়া মারসিলিও।*

পাঠ-১

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বৈশিষ্ট্যঃ-

- **ধর্ম বিশ্বাসঃ** মধ্যযুগে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে ধর্ম বিশ্বাস ছিল মানব জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। রাষ্ট্রচিন্তা গভীরভাবে খ্রিষ্ট ধর্মের মূলনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। চার্চ ও রাষ্ট্র ছিল এক ও অভিন্ন। গির্জার পুরোহিতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন ধর্মের ধারক ও বাহক। কোন সৃজনশীল, স্বাধীন ও স্বকীয় চিন্তা-ভাবনা মধ্যযুগে গড়ে উঠে নি। গির্জাই ছিল যাবতীয় জ্ঞানের রক্ষক ও প্রচারক। পুরোহিততন্ত্রের উত্থান মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অধ্যাপক স্যাবাইন বলেন "Christianity was a doctrine of salvation"
- **বিশ্বজনীনতাবাদঃ** মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য হল তার বিশ্বজনীনতাবাদ। রোমানরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের সাম্রাজ্য ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রত্যক্ষ ফল। অতত্রব তা সার্বজনীন ও শ্বাশত। খ্রিষ্টধর্ম এই গভীর বিশ্বাসের প্রতি জোরালো সমর্থন দিয়েছিল। সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর এই ধর্ম সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। রোম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে গির্জা একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ বিশ্বজনিন সমাজের একটি রূপ হল সাম্রাজ্য এবং অন্যরূপ হল চার্চ।
- **রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যে বিরোধঃ** মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যকার বিরোধ ও সংঘর্ষ। দীর্ঘ সময় ধরে এই বিরোধ বিদ্যমান ছিল। ফলে ধর্ম ও রাজনীতি কোনটাই সঠিক পথে পরিচালিত হয় নি। ওয়ানলাস বলেন, "মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শন গির্জা ও রাষ্ট্র শক্তির আধিপত্য বিস্তারের বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।" রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে সম্রাট এবং গির্জার প্রধান হিসেবে পোপ-এই দুই কর্তৃত্বের বিরোধের মধ্যে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেনসহ সমগ্র ইউরোপে গীর্জার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। গির্জার প্রভাব বৃদ্ধি ও হ্রাস দু'টোই ঘটেছিল মধ্যযুগে। এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পোপ তাঁর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে পোপের প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পেতে থাকে।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে ছিল না।

- **অরাজনৈতিকঃ** মধ্যযুগ ছিল মূলত অরাজনৈতিক। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অধ্যাপক গেটেলের মতে,"রোমান আইনশাস্ত্রের প্রসারের কথা বাদ দিলে গ্রীক নগর রাষ্ট্রের পতনের পর থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানের আগ পর্যন্ত রাষ্ট্র দর্শন ছিল অরাজনৈতিক ধরনের। অধ্যাপক ডানিং বলেন " The middle age was unpolitical. lts aspirations and ideals centered around the form and content of religious belief."এ যুগের আশা-আকাঙ্খা ও মতাদর্শ ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। মুক্তচিন্তার অভাবে রাজনৈতিক দর্শন ধর্মীয় চেতনা ও ন্যায় শাস্ত্রের গভীর গহবরে বন্দি ছিল। মধ্যযুগে রাষ্টচিন্তা ছিল, কিন্ত রাষ্ট্রতত্ত্ব ছিল না। রাজনৈতিক বিষয়াদির ব্যাপারে মধ্যযুগ গভীরভাবে মনোনিবেশ করেনি। জনগণ নিজেদেরকে মূলত: ঐশ্বরিক চিন্তা-

ভাবনায় নিয়োজিত রাখত। খ্রিষ্টীয় চিন্তাবিদদের ধারণায় মানব সমাজে দ্বৈতসংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। একটি হচ্ছে আত্মিক এবং অপরটি জাগতিক। গির্জা এবং পুরোহিতগণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করতো। অপরদিকে সম্রাট রাজনৈতিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতো।

- **শোষণের ইতিহাস:** মধ্যযুগের ইতিহাসকে দীর্ঘ শোষণের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজের বিকাশের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। যাজকেরা পাপ-পূণ্য ও পরলোকের ভয়ের কথা বলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ ও আনুগত্য আদায় করত। বিদ্যমান আর্থ-সামজিক ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিশেষের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে।

মধ্যযুগে সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতীক ছিল রাজা

- **সামন্তবাদ:** মধ্যযুগে রাজা ও গির্জার মধ্যে বিরোধ যখন তুঙ্গে, ঠিক সে সময় উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রের। সামন্তবাদ এক ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার কেন্দ্র ছিল ভূমি। ভূমিভিত্তিক ক্ষমতা, অধিকার ও সুবিধা প্রভৃতি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের শাসক বলতে সামন্ত প্রভুদের বোঝাতো। অধ্যাপক ডানিং উল্লেখ করেন, মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা একদিকে গির্জা বনাম রাষ্ট্র, অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল।
- **রাজতন্ত্রের বিকাশ:** রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রায় সমার্থক ছিল। হার্নশ এর মতে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের চুক্তির গোড়াপত্তন হয় মধ্যযুগে। জনগণ তখন ধারণা পোষণ করতো যে, রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত তাই তিনি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করতে পারেন না।
- **সুসংগঠিত রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি:** মধ্যযুগে কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ছিল না। এই যুগের শেষের দিকে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং এর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে রাষ্ট্রের প্রভাব খুব ব্যাপক ভিত্তিক ছিল না।
- **সাম্রাজ্য:** মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সাম্রাজ্য। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর তাদের আইনী কাঠামো ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রচিন্তা ও দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে ভাটা পড়লেও মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্টার চিন্তা ও ধারাবাহিকতা ছিল একটি বাস্তব সত্য।
- **অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রচিন্তা:** অনেকের মতে মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল অবৈজ্ঞানিক। তবে আধুনিক বিচারে কোনক্রমেই তা গুরুত্বহীন ছিল না। মধ্যযুগের সংঘাতময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভর করেই আধুনিক যুগের আগমন ঘটেছে। মধ্যযুগের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল হচ্ছে আধুনিক ইউরোপ।

সারকথা:

মধ্যযুগে ধর্ম বিশ্বাস ছিল মানব জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। রাজনীতি ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে সমাজ বিকাশের গতি ছিল মন্থর। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু ছিল ভূমি। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা গির্জা ও সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মধ্যযুগে মানব জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি কি ছিল?
(ক) রাজতন্ত্র; (খ) পোপ;
(গ) ক্ষমতা; (ঘ) ধর্ম বিশ্বাস।

২। "Christianity was a doctrine of salvation" এই বক্তব্যটি কার?
(ক) টমাস একুইনাস; (খ) সেন্ট অগাষ্টিন;
(গ) অধ্যাপক স্যাবাইন; (ঘ) অধ্যাপক ডানিং।

৩। 'The middle age was unpolitical' এই উক্তিটি কার?
(ক) কনষ্ট্রানটাইন; (খ) অধ্যাপক ডানিং;
(গ) অধ্যাপক গেটেল; (ঘ) অধ্যাপক স্যাবাইন।

৪। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে কোন শতাব্দীতে?
(ক) ষোড়শ শতাব্দীতে; (খ) এয়োদশ শতাব্দীতে;
(গ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে; (ঘ) চতুর্থদশ শতাব্দীতে।

উত্তরমালা ঃ- ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। মধ্যযুগে গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন ছিল?

২। অধ্যাপক ডানিং মধ্যযুগ সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-২

সেন্ট অগাষ্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রিঃ)

এ পাঠটি শেষে আপনি-

- ❑ সেন্ট অগাষ্টিন-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ অগাষ্টিনের চিন্তাধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তাজগতে সেন্ট অগাষ্টিন একটি বিশিষ্ট নাম। মধ্যযুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। বিশ্ব ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে ৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার নুমিদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন নিঃধর্ম গোষ্ঠীয় প্যাগান (Pagan) এবং মাতা ছিলেন একজন গোঁড়া খ্রিষ্টান। তাঁর মাতার কাছ থেকেই তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। বাল্যকালে অগাষ্টিন তাঁর গুরু সেন্ট এমব্রোসের (Ambrose) সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেন। স্বল্পকালের মধ্যে তিনি তাঁর সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা গুরুর প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ৩৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর অসাধারণ ধর্মজ্ঞান ও পান্ডিত্যের জন্য তিনি উত্তর আফ্রিকার হিপ্পো নামক স্থানের ধর্মযাজকের পদ অলংকৃত করেন। ৪৩০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অগাষ্টিনের চিন্তার উল্লেখযোগ্য দিক হল খ্রিষ্টান কমনওয়েলথ সম্পর্কে ধারণা। কমনওয়েলথকে তিনি আধ্যাত্মিক বিকাশের চরম রূপ বলে গণ্য করেছেন। খ্রিষ্টান কমনওয়েলথের ধারণা শুধু মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক যুগেও ব্যপ্তি লাভ করেছে। সেন্ট অগাষ্টিনের রচনাবলীর মধ্যে *(The city of God)* অর্থাৎ *'ঈশ্বরের নগরী'* হচ্ছে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অগাষ্টিনের সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। তাঁর এই রচনা সমগ্র মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে এটি ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রন্থ। তাঁর মতে সমগ্র মানব সমাজ এই নগরীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর সময়ে তিনি যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। রাষ্ট্রচিন্তায় মধ্যযুগীয় যে স্রোত ধারা প্রবাহিত হয় তার গতিসীমা বহুলাংশে তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। অধ্যাপক স্যাবাইন যথার্থই বলেছেন, তাঁর রচনাগুলো ছিল চিন্তার খনি বিশেষ যা থেকে পরবর্তীকালে ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট চিন্তাবিদ ও লেখকগণ মনিমুক্তা আহরণ করেছেন। তাঁর "*The city of God*" গ্রন্থটি প্রত্যেকের নিকট ছিল একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইতিহাসের এক সংকটকালে লিখিত হয়েছিল এ গ্রন্থটি। কতকগুলো নির্দিষ্ট চিন্তার সন্ধান এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। *'সিটি অব গড'* এর মধ্যে আমরা মধ্যযুগের একটা সুন্দর চিত্র পাই। সেন্ট অগাষ্টিনের চিন্তাধারার মূলে ছিল রোম সাম্রাজ্যের বিপর্যয়। তাঁর সময় রোমান সভ্যতা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। রোমান সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর বহিরাগত জাতিগুলো এসে রোমান সভ্যতা ও খ্রিষ্ট ধর্মের উপর চরম আঘাত হানে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতিতে চরম সংকট দেখা দেয়। রাজনীতিক অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্য সর্বত্র বিরাজ করতে শুরু করে। গির্জা ও রাজশক্তির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ ও সংকটকে আরো ঘনিভূত করে তুলেছিলো। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য খ্রিষ্টান ও বহু প্যাগানরা পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে থাকে। বহু প্যাগানদের উত্থান এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব হ্রাস তাঁকে চিন্তিত করে তোলে। তিনি রোমের পতনকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন বলে মনে করেন। তিনি প্যাগানদের আক্রমণ থেকে খ্রিষ্টধর্ম রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন।

অগাষ্টিনের ঈশ্বরের নগরী একটি বিমূর্ত ধারণা।

অগাষ্টিন রাষ্ট্র ও খ্রিষ্টধর্মকে পাশাপাশি রাখেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রকে মান্য করার প্রধান কারণ হল এই যে, রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার পেছনে ঐশ্বরিক এক পরিকল্পনা থাকে যা তার কার্যকলাপকে ধর্মীয় লক্ষে পৌছাতে সহায়তা করে। এ ছাড়া রাষ্ট্রকে মান্য করার আর একটি কারণ হল রাষ্ট্র শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্পত্তি রক্ষা করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য এমন হওয়া প্রয়োজন যা স্রষ্টার বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের কোন আইন ইশ্বরের আইনের বিরোধি হলে নাগরিকগণ সে আইন মানবে না। অগাষ্টিন ধর্মতত্ত্ব ও খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জোরালোভাবে বলেন যে, রোমান সাম্রজ্যের পতনের জন্য কোন ক্রমেই খ্রিষ্টধর্ম দায়ী নয়। তিনি বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, কোন দেবতার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অথবা আর্শিবাদ বা অভিশাপের কারণে কোন সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে পারে না। তাঁর গ্রন্থ *'সিটি অব গড'* এ তিনি দার্শনিক তত্ত্ব ও ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। *'সিটি অব গডের'* চমকপ্রদ বিষয় হল দুই শহরের কাহিনী। একটি শহরের অবস্থান স্বর্গে, অন্যটি পৃথিবীতে । মানুষের দু'টি সত্তা যেমন দেহ ও আত্মা, এই দুই রাজ্যের প্রতীক। প্রতিটি মানুষ উভয় রাজ্যের নাগরিক।

স্বর্গরাজ্য আত্মার এবং প্রার্থিব রাজ্য দেহের

স্বর্গরাজ্য হল সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মহত্বের সাম্রাজ্য। বিধাতার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য এবং স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি হল এর বৈশিষ্ট্য। পার্থিব রাজ্য লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, নীচতা ও হিংসায় ভরপুর। এই রাষ্ট্র অস্থায়ী, কিন্তু স্বর্গরাজ্য চিরস্থায়ী। পার্থিব রাজ্য অন্ধকার, মোহ, ক্ষমতালিপ্সা, আত্মপ্রীতি, কালিমা ও কামনায় আচ্ছন্ন। অন্যদিকে স্বর্গরাজ্য জ্যোর্তিময়, চিরভাস্বর প্রেম-প্রীতি, আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিক শক্তির জগত। পরিপূর্ণ আলোর জন্য এটা হচ্ছে অনাবিল শান্তির জগত। সেন্ট অগাষ্টিন বলেন যে, ন্যায়নীতি ও শান্তি হল স্বর্গরাজ্যের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ন্যায়নীতি ও শান্তির আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল স্বর্গরাজ্যের অনুরূপ শাসন ব্যবস্থায়। ন্যায়নীতি হল সেই গুণ ও সততা যার ফলে যার যা প্রাপ্য তা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

ন্যায়নীতি হলো রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ। ন্যায়নীতি প্রত্যাহার করা হলে রাষ্ট্র ও এক বিরাট দস্যু দলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এ ভাবে স্বর্গরাজ্যের প্রশংসা করে তিনি সার্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অগাষ্টিন বিশ্বাস করতেন যে, গির্জার প্রতি আনুগত্য ও প্রেম স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। তিনি উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীতে গ্রির্জাই হল স্বর্গরাজ্যের প্রতিনিধি। আর এ কারণে গির্জাকে মান্য করা উচিত। গির্জার মাধমে সমাজ পরিচালিত হবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল সার্বজনীন খ্রিষ্টীয় সমাজ (Universal Christian Society) প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মতে গির্জা একটি বাস্তব ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান,যার মাধ্যমে মানুষ মুক্তির সন্ধান পেতে পারে। তিনি গির্জাকে সামাজিক মানুষের মহা মিলন স্থান বলেছেন। সমাজে গির্জার ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। এভাবে অগাষ্টিন রাষ্ট্রের উপর গির্জার প্রধান্য বিস্তারের কথা ব্যাখ্যা করেন। অগাষ্টিনের চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের উপরে আআত্মিক মুক্তিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা ও ধর্মকে বাদ দিয়ে তিনি কোন কিছুই আলোচনা করেন নি। মানুষের চরিত্র গঠন ও সমাজকে সুন্দর করার জন্য রাজনীতির চেয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ অধিক প্রয়োজন। তাঁর মতে ধর্মবর্জিত রাজনীতি মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, জনগণের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অগাষ্টিনের মতে মানুষের ইতিহাস হল স্বর্গীয় ও পার্থিব শহরের সংগ্রামের ইতিহাস। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম ও অধর্মের বিরোধ চলে আসছে। সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভর প্রতীক হল স্বর্গীয় ও পার্থিব শহর। সমাজে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি থাকবেই। এবং এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়ের জয় হবে। স্বার্থপরতা, ক্ষমতা ও অর্থের লিপ্সা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। মানুষ

ন্যায়নীতি ছাড়া আদর্শ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়

সততা ও ন্যায়নীতিই মানুষের মুক্তি আনতে পারে

যখন আত্মার দ্বারা শাসিত হয় তখনই ন্যায় বিচার অর্জিত হয়। অগাষ্টিন ন্যায় বিচার তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।

সারকথা ঃ

মধ্যযুগে গির্জা ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিরোধের সন্ধিক্ষণে সেন্ট-অগাষ্টিনের চিন্তাধারা রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তাবিদ ও যাজকদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। চিন্তাবিদ ক্রিষ্টোফার মরিস যথার্থই বলেছেন,"অগাষ্টিনের চিন্তাধারা মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশী সমাদৃত হয়েছে।" রোমান সাম্রাজ্যের দুর্দিনে সেন্ট-অগাষ্টিন খ্রিষ্টধর্মের ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসেন। সেন্ট অগাষ্টিন ছিলেন মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয়-চার্চের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সেন্ট অগাষ্টিন খ্রিষ্ট ধর্মের প্রাথমিক ধারণা কার কাছ থেকে লাভ করেন?
(ক) বাবার কাছ থেকে; (খ) মা'র কাছ থেকে;
(গ) গুরু এমব্রোসের কাছ থেকে; (ঘ) পোপের কাছ থেকে।

২। মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল কোন গ্রন্থটি?
(ক) *আল মোকদ্দিমা;* (খ) *দি রিপাবলিক;*
(গ) *দি সিটি অব গড।*

৩। মানুষের চরিত্র গঠন ও সমাজকে সুন্দর করার জন্য রাজনীতির চেয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ অধিক প্রয়োজন। এই বক্তব্যটি কার?
(ক) সেন্ট-এমব্রোসের; (খ) প্যাগানদের;
(গ) অষ্টিনের; (ঘ) সেন্ট অগাষ্টিনের।

৪। সেন্ট অগাষ্টিনের মতে ক্ষমতা, স্বার্থপরতা ও অর্থের লিপ্সা মানুষকে কোন পথে পরিচালিত করে?
(ক) সুপথে; (খ) বিপথে;
(গ) কল্যাণের দিকে; (ঘ) শান্তির দিকে।

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। সেন্ট-অগাষ্টিনের চিন্তাধারা আলোচনা করুন।

২। *সিটি অব গড* পুস্তকটির মূল বক্তব্য কি?

পাঠ-৩

টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ❑ টমাস একুইনাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবেন;
- ❑ তাঁর আইনতত্ত্ব বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে একুইনাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মধ্যযুগের চিন্তাবিদ টমাস একুইনাস সিসিলি ও ক্যাম্পনিয়া রাজ্যের উপশহর রককানিক্কা নামক স্থানে ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে *Summa Theologica* অমর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদ এরিস্টটলের ধ্যান-ধারণার সাথে রোমের আইন ও খ্রিষ্টান ধর্মের সমন্বয় ঘটান। অল্প বয়স থেকেই তিনি দর্শন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি প্যারিসে গমন করে আলবার্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার জ্ঞানের গভীরতা ও উদারতার জন্যে তিনি সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর মতবাদে মধ্যযুগের তিনটি মহান চিন্তাসূত্র প্রতিফলিত হয়েছে। (১) বিশ্বজনীনতা (২) পান্ডিত্যবাদ ও (৩) এরিস্টটলীয় দর্শন।

আইন তত্ত্ব (Theory of law)

আইন সম্পর্কিত তত্ত্ব ও চিন্তাধারায় টমাস একুইনাসের মৌলিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আইন সংক্রান্ত চিন্তা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ধারণার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে ইউরোপীয় চিন্তাধারার মাধ্যমে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। একুইনাসের মতে,আইন হল ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি ও নিয়ম। এই পদ্ধতি ও নিয়ম দ্বারা মানুষ কোন কাজ করতে প্রলুব্ধ হয় অথবা কোন কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।(Law is a rule or measures of acts, whereby man is induced to act or restrained from acting) তিনি বলেন যে, আইন হল যুক্তির প্রকাশ। জীবনের উদ্দেশ্য সাধন এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি আইনকে সামাজিক কল্যাণ বাস্তবায়িত করার একটি কার্যকর পদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন।

আইন হল যুক্তির প্রকাশ

একুইনাস আইনকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ

- শাশ্বত আইন (Eternal Law);
- প্রাকৃতিক আইন (Natural law);
- ঐশ্বরিক আইন (Divine law);
- মানবিক আইন (Human law)।

শাশ্বত আইনঃ শাশ্বত আইন বা চিরন্তন আইনকে একুইনাস সর্বোচ্চ আইনের মর্যদা দিয়েছেন। চিরন্তন আইন হল সেই স্বর্গীয় যুক্তি যার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আইন সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত এবং ক্রিয়াশীল। এ আইন দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাঁর মতে এ আইনের নির্দেশ অন্যান্য আইনকে মেনে চলতে হবে। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাই শাশ্বত আইনের আকারে পার্থিব সমাজে প্রচলিত।

প্রাকৃতিক আইনঃ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক আইন বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। টমাস একুইনাসের মতে,"এটি শাশ্বত আইনের সেই অংশ যা যুক্তিবাদী প্রাণী মানুষ এবং অযুক্তিবাদী জড় বস্তুর জন্য আমাদের প্রতিপালক প্রকাশ করেন।" প্রতিটি জীব ও বস্তুর মধ্যে এ আইনের প্রতিফলন ঘটে। প্রাকৃতিক আইনের প্রভাবে মানুষ সন্তান জন্মদান এবং লালন পালন করে। এই আইনের তাড়নার মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রয়াসী হয়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সৎ ও ভালকে পেতে চায় এবং অন্যায় ও মন্দ কাজকে এড়িয়ে চলে। দয়া- মায়া,প্রেম-প্রীতি মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার। বিধাতা মানুষকে যে স্বাভাবিক গুণাবলী দিয়েছেন সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে জীবনকে সুন্দর ও যথার্থভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। একুইনাসের মতে একমাত্র স্বাভাবিক আইনের ব্যবহারের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

ঐশ্বরিক আইনঃ ঐশ্বরিক আইন বলতে প্রধানত: বিধাতা কর্তৃক যেসব আদেশ-নিষেধ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে যেমন, বাইবেল, কুরআন প্রভৃতির মাধমে নির্দেশ করেছেন সেগুলোকে বুঝিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে প্রেরিত দূতের মাধ্যমে মানুষের জন্য করণীয় ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে এ আইন প্রদান করেছেন। এ আইন মানুষের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সাধারণত: এ আইনগুলো হচ্ছে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ। একুইনাস বলেন যে, ঐশ্বরিক আইনকে স্বাভাবিক আইনের বিরোধী বলে মনে করা অনুচিত। ঐশ্বী বাণীর মাধ্যমে মানুষ যে নির্দেশ লাভ করেছে তাই ঐশ্বরিক আইন। ঐশ্বরিক আইন দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ আদি বিধি (Old testament) ও নববিধি (New testament)। বিচার-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা হেতু মানুষে-মানুষে প্রায়ই বিরোধ দেখা দেয়। এর নিষ্পত্তির জন্য ঐশ্বরিক আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

মানবিক আইনঃ মানবিক আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একুইনাস বলেন, সমাজ ও সম্প্রদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির মাধ্যমে ঘোষিত এবং যুক্তি থেকে উৎসারিত বিধান হল মানবিক আইন। মানবিক আইনগুলো হল সাধারণ কল্যাণের জন্য যুক্তির নির্দেশ। সমাজের নৈতিকতা ও সদাচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানবিক আইনের গুরুত্ব কম নয়। এরিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনি প্রাকৃতিক আইন ও তার বাস্তবায়নের জন্য মানবীয় আইনের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। কেবল পাপীকে শাস্তি প্রদান নয়, ঐশ্বরিক যুক্তিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যও মানিবক আইনের প্রয়োজন।

মানবিক আইনগুলো হল সাধারণ কল্যাণের জন্য যুক্তির নির্দেশ।

টমাস একুইনাস মানবিক আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

যেমনঃ

- মানবিক আইনের বিষয়বস্তু হবে শুধুমাত্র জাগতিক ও মানবিক;
- কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানবিক আইন প্রণীত হবে না;
- মানবিক আইন বৈধ ও সঠিক উৎস হতে উদ্ভুত হবে;
- মানবিক আইনের গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতার জন্য যুক্তির শাসন অপরিহার্য;
- অভিন্ন কল্যাণের (Common good) সাথে মানবিক আইন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

আইন সম্পর্কে টমাস একুইনাসের আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁর আইন তত্ত্বে যুগের প্রভাব রয়েছে। শাসকের ক্ষমতা অবশ্যই আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।তাঁর মতে শাসকের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। তিনি স্বেচ্ছাচারী সরকারের পরিবর্তে বৈধ সরকার (Lawful government) সমর্থন করেছেন।

আইনতত্ত্ব আলোচনায় টমাস একুইনাস বলেন যে, মানুষের জীবনে দুটি সত্তা বিদ্যমান- একটি পার্থিব অন্যটি আধ্যাত্মিক। মানুষের পার্থিব লক্ষ্য অর্জিত হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে। কিন্তু আধ্যাত্মিক মুক্তি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় তত্ত্বের বিষয়। তাঁর আইনতত্ত্বে যুক্তি ও বিশ্বাসের

সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রীয়দর্শন ও ধর্মীয়নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। স্যাবাইন বলেন একুইনাসের উদ্দেশ্য ছিল মানবীয় আইন ও দৈবিক আইনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা।

রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে একুইনাসের ধারণা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলকে অনুসরণ করে টমাস একুইনাস বলেন যে, রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক সংস্থা এবং এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধণের জন্যই। একুইনাস এরিস্টটলের সংঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের অস্তিত্ব রাষ্ট্র ও সরকারকে অপরিহার্য করে তুলেছে। রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ সংস্থা। তিনি উল্লেখ করেন যে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ কেবল রাষ্ট্রই মেটাতে পারে। কল্যাণকর সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। সৎ ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্রের এক উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রকে এমনভাবে সুসংহত করতে হবে যাতে পার্থিব সুখের উর্ধ্বে যে অপার্থিব শান্তি ও আনন্দ বিরাজমান তা যেন অর্থহীন না হয়ে পড়ে। এজন্য রাষ্ট্রের উচ্চতর সংগঠন তথা চার্চের প্রতি রাষ্ট্রের আনুগত্য থাকতে হবে। আত্মার মুক্তির জন্য খ্রিষ্টীয় চার্চ যাতে যথাযথ ভুমিকা পালন করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবে।

রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধাণের জন্যই।

সরকার সম্পর্কে একুইনাসের ধারণা এরিস্টটলের ধারণার অনুরূপ। তিনি রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ সরকার বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন সমগ্র বিশ্বে রয়েছে এক সৃষ্টিকর্তা, এক ঈশ্বর। দেহের বা শরীরের হাজারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রয়েছে এক অন্তকরণ। যেমন মৌমাছির রয়েছে এক রাজা। অনুরূপভাবে প্রতিটি স্বাভাবিক সরকার হল একজনের সরকার। ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সরকার সামাজিক ঐক্য ও শান্তি বিঘ্নিত করে তুলতে পারে। একজন শাসকই হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠার যোগ্যতম প্রতিভু। রাজতন্ত্র যাতে সেচ্ছাচারী না হয়, সে জন্য তিনি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের চেয়ে নির্বাচিত রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। তিনি রাজতন্ত্রের ক্ষমতা সীমিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। এরিষ্টলের অনুকরণে একুইনাস দু'টি নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। প্রথমত: সকলের মঙ্গল,দ্বিতীয়ত,শুধু শাসকের মঙ্গল।

সরকার যখন সকলের মঙ্গলসাধন করার লক্ষ্যে শাসন করে তা কল্যাণকর ন্যায়পরায়ণ ও বৈধ শাসনা

সরকার যখন নিজেদের স্বার্থে শাসন করে তখন তা অকল্যাণকর, বিকৃত ও অবৈধ সরকার। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার জন্য তিনি জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কাজে সংক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি উল্লেখ করেন, যে সরকার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় না তা অবৈধ ও পীড়নমূলক সরকার। সমাজের শান্তি ও ঐক্য বিনষ্ট হলে কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।

সারকথা

টমাস একুইনাস প্রাচীন গ্রীক রাস্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটলের ধ্যান ধারণার মধ্যে রোমের আইন ও খ্রিষ্টীয় ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছেন। আইন সম্পর্কিত তত্ত্ব ও চিন্তাধারায় তাঁর মৌলিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় যুক্তিবোধের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। টমাস একুইনাস কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১২৭৪ সালে; (খ) ১২২৫ সালে;
(গ) ১২৩০ সালে; (ঘ) ১২২০ সালে।

২। টমাস একুইনাস জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কাজে কেন অংশ গ্রহণ করতে বলেছেন?

(ক) সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার জন্য; (খ) জনকল্যাণের জন্য;
(গ) শোষণ বন্ধ করার জন্য; (ঘ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য।

৩। নাগরিকের নৈতিক উন্নতির জন্য একুইনাস কিভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের কথা বলেছেন?

(ক) ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী; (খ) বিবেক অনুসারে;
(গ) বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী; (ঘ) আইন অনুযায়ী।

৪। একুইনাসের মতে সৃষ্ট জীব-জন্তু ও বস্তুর মধ্যে কোন আইনের প্রতিফল ঘটে?

(ক) ঐশ্বরিক আইনের; (খ) মানবিক আইনের;
(গ) প্রাকৃতিক আইনের; (ঘ) রাষ্ট্রীয় আইনের।

সঠিক উত্তর মালা ঃ ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪ ।গ

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে টমাস একুইনাসের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২। আইনতত্ত্ব সম্পর্কে একুইনাসের চিন্তা আলোচনা করুন।

৩। টমাস একুইনাসের রাষ্ট্রচিন্তা ব্যাখ্যা করুন। তাঁকে কি মধ্যযুগের এ্যারিষ্টটল বলা যায়?

পাঠ-৪

মারসিলিও পাদুয়া (১২৭০-১৩৪৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

- ❑ মারসিলিওর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ মারসিলিও রাস্ট্রদর্শনে এরিষ্টটলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ❑ রাষ্ট্র ও শাসক সম্পর্কে মারসিলিওর অভিমত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ আইন ও আইন প্রণেতাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মারসিলিও পাদুয়া মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট লেখক ও পোপতন্ত্র বিরোধী রাষ্ট্র চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির অন্তর্গত পাদুয়া নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন গুণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি ছিলেন একাধারে আইনবিদ, শিক্ষক, যাজক, চিকিৎসক ও রাজনীতিক। প্রফেসর মারে (Murray) মারসিলিওকে চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ট চিন্তাবিদ বলে উল্লেখ করেন। পাদুয়ার অনবদ্য রচনায় নাম *'ডিফেনসর প্যাসিস' (Defensor Pacis)* যার শাব্দিক অর্থ শান্তির রক্ষক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ ডিগ্রী লাভ করে প্রথমে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। ১৩১২ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর মনোনীত হন। তাঁর শেষ দিনগুলো অতিবাহিত হয় জার্মান সম্রাট ব্যাভারিয়ার লিউইসের রাজ দরবারে। ১৩৪৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মারসিলিও-এর রাষ্ট্রদর্শন: এরিস্টটলের প্রভাব

গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মারসিলিও পাদুর্য়া তাঁর রাষ্টতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর *'ডিফেনসর প্যাসিস'* গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সরকারের ধারণা, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, রাষ্ট্র -গির্জার সম্পর্ক ও আইনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগের রাষ্ট্রতত্ত্বের শুধু বিকাশই নয় বরং সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে *ডিফেনসর প্যাসিস* একটি যুগান্তকারী রচনা।

মারসিলিওর বন্ধু ফরাসী পন্ডিত জান্দুনের (Jandun) সহযোগীয়তায় ১৩২৪ সালে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। ম্যাক ইলওয়েনের মতে এয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত গ্রন্থের মধ্যে *'ডিফেনসর প্যাসিস'* একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে তিনি রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় খন্ডে গির্জার উৎপত্তি, বিকাশ ও সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় খন্ডে রয়েছে আগের দু'খন্ডের বিষয় বস্তু আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা ও আলোচনা করেছেন তাদের সকলেই মারসিলিওর সমুন্নত দৃষ্টিভংগীর প্রশংসা করেছেন। মধ্য যুগে জনগণের হাতে ক্ষমতা দেয়ার কথা বলে তিনি গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

এরিস্টটলকে অবলম্বন করে তিনি ধর্মকে দর্শন থেকে যুক্তিকে বিশ্বাস থেকে এবং গীর্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেন

চিন্তাবিদ এরিস্টটল বিপ্লব সম্পর্কে যা আলোচনা করেছেন মারসিলিও সেগুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এরিস্টটল যেভাবে প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে কোন কিছুর সত্যতা বা যথার্থতা বিচার করতেন, মারসিলিও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রকৃতিবাদ ও যুক্তিবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরিস্টটলকে অবলম্বন করে তিনি ধর্মকে দর্শন থেকে যুক্তিকে বিশ্বাস থেকে এবং গীর্জাকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করেন। তিনি

আরও উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র স্বাধীন ও স্বার্বভৌম। তাই বলা যায় মারসিলিওর রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কিত ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের ধারণার অনুরূপ।

রাষ্ট্রঃ

মারসিলিও রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাবার জন্য রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, সমাজবদ্ধতা মানব চরিত্রের মহৎ গুণ। সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে সহযোগীতাই হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। তিনি উল্লেখ করেন যে, কৃষক-শ্রমিক, সৈনিক, বনিক, সরকারী কর্মচারী,পুরোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত এবং এদের সুসংহত প্রচেষ্টার ফলে রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জিত হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করলে রাষ্ট্র সুস্থ্য ও সবল হয়ে উঠে এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দায়িত্ব অবহেলা করলে কিংবা অন্যের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করলে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। রাষ্ট্রের সুস্থ্য ও শন্তিপূর্ণ অবস্থাকে মারসিলিও Tranquillys হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে যদি সমক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বিরাজ করে এবং একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে তাহলে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত হয়।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে- জনসাধারণ যাতে উত্তম জীবন যাপন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান

মারসিলিওর রাষ্ট্রতত্ত্ব জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল ব্যাপারে যাজকদের যে কোন রকমের বল প্রয়োগের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। জাগতিক সকল ব্যাপারে তিনি গির্জাকে রাষ্ট্রের অধস্তন বিভাগে পরিণত করার কথা জোরালো ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি পোপের বিশেষ প্রাধান্যের দাবিকে অস্বীকার করে বলেন যে, পোপ অন্যান্য যাজক বা বিশপদের মতই একজন সাধারণ ব্যক্তি এবং তাঁদের সবার মর্যাদা সমান। তাঁর এই বক্তব্য গীর্জার প্রচলিত স্বার্বভৌম ক্ষমতাতত্ত্বের মূলে আঘাত হানে। তিনি ইতালী তথা সমগ্র ইউরোপের দ্বন্দ্ব- সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে বলেন যে, এর মূলে রয়েছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পোপের প্রাধান্য। মারসিলিও এই প্রাধান্যের অবসানের দাবি তুলে জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চূড়ান্ত শক্তি হিসেবে প্রমাণ করেন।

মারসিলিও রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যথা (১) **প্রতিরোধমূলক** ও (২) **সহযোগিতামূলক**। এই বিবিধ কর্মকান্ড মানুষের চরিত্র থেকে উৎসারিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিরোধমূলক কার্য রাষ্ট্রের কর্মকান্ডকে প্রতিহত করে এবং সহযোগিতামূলক কার্য রাষ্ট্রের কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করে। তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেন যে, মানুষের মধ্যে একদিকে স্বার্থপরতা ও কলহপ্রিয়তা রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে যুক্তিবোধ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব। পরবর্তীতে দার্শনিক হব্‌স্ এক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই প্রবণতা থেকে সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুন্দর সমাজের জন্য সরকারের প্রাথমিক কাজ হল মানুষের অসামাজিক প্রবণতাগুলো দমন করা। সরকারের দ্বিতীয় কাজ হল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শান্তির অর্থ হল নিরাপত্তা বোধ। সামাজিক নিরাপত্তা মানুষকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত করে।

শান্তির অর্থ হল নিরাপত্তা বোধ

মারসিলিও সরকারের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি। তাঁর আইন ও আইন প্রণেতা তত্ত্ব থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি গণতন্ত্রের চেয়ে রাজতন্ত্রকে শ্রেয় বলে মনে করেছেন। তিনি যে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল এই যে, রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক না হয়ে নির্বাচিত হবে। রাজতন্ত্র নির্বাচিত পর্যায়ের হলেই জনগণের সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। তাঁর এই ধারণায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

আইন ও আইন প্রণেতাতত্ত্ব

আইন সম্পর্কে মারসিলিওর ধারণা তাঁকে এরিস্টটল ও মধ্যযুগ থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। মধ্যযুগের চিন্তাবিদ ও লেখকগণ আইনকে সাধারণের কল্যাণ ও যুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করতেন। তিনি এই প্রথার অবসান ঘটান। আইনকে তিনি সরকার সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, 'সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য যা কল্যাণকর ও ন্যায়সংগত তার যথাযথ উপলব্ধি হলো আইন।' আইন হলো ন্যায় নীতির বিধান। তাঁর মতে আইন হল এমন সব বিধি বিধানের সমষ্টি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিবোধপ্রসূত, যা সার্বজনিন ও স্বীকৃত কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযোজ্য এবং যার পিছনে রয়েছে ক্ষমতার সমর্থন। তিনি আইনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা আধুনিকতার আলোকে সমুজ্জ্বল। মার্সিলিওর আইন প্রণেতার ধারণা তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছে।

আইন হলো ন্যায় নীতির বিধান

মারসিলিও আইনকে মূলত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা: ঐশ্বরিক আইন ও মানবিক আইন। ঐশ্বরিক আইন হল ঈশ্বরের নির্দেশ। কিন্তু মানবিক আইন মানুষের তৈরী। তিনি ঐশ্বরিক আইন ও মানবিক আইনের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, ''ঐশ্বরিক আইন মানুষের ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পর্কে মানুষের কোন ধ্যান ধারণা ছাড়াই সরাসরি বিধাতার কাছ থেকে আগত এমন এক আদেশ যা কেবল মানুষের পরলৌকিক জীবনের উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিংবা মানুষের জন্য বাঞ্চনীয় কতিপয় শর্ত সুনিশ্চিত করার জন্য ইহলোকে পালন বা বর্জন করা হয়।" মানবিক আইন মানুষের ঐচ্ছিক কার্যাবলীর জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরাসরি আগত সকল নাগরিকের কিংবা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের একটি বিধান। এটি ইহকালের উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য বা মানুষের জন্য কাঙ্খিত কতিপয় শর্ত নিশ্চিত করার জন্য শুধু ইহজগতেই পালিত বা বর্জিত হয়।

মানবিক আইনের উৎস হচ্ছে জনগণের সমষ্টিগত কার্যক্রম

ঐশ্বরিক ও মানবিক আইন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিধান। ঐশ্বরিক আইনের উৎস স্বয়ং বিধাতা এবং তাতে মানুষের তেমন কিছু করণীয় নেই। অন্যদিকে মানবিক আইনের উৎস হল মানুষ নিজে। এখানে ধর্মের কিছু করণীয় নেই। মারসিলিও আইনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে তিনি যুক্তি বা ন্যায় বিচার অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আইনকে সফলভাবে কার্যকর করতে হলে আইন হতে হবে সার্বজনীন ইচ্ছার প্রকাশরূপ। এক্ষেত্রে তিনি আইন প্রণেতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মারসিলিও সমগ্র জনগণকে কিংবা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশকে আইন প্রণেতা বলে অভিহিত করেছেন। আইন প্রণেতার সামনে তিনি একজন ব্যক্তিকে বসিয়ে দিতে চাননি। তাঁর আইন প্রণেতাতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি রাজাকে জনগণের প্রভুর আসন থেকে নামিয়ে তাদের সেবকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন যে, আইনের প্রধান উৎস হল আইন প্রণয়ণকারী নিজে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে।

শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে।

সারকথা :

মারসিলিও মধ্যযুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মারসিলিও তার 'ডিফেনসর প্যাসিস' গ্রন্থে সরকারের ধারণা, রাষ্ট্র ও গির্জার সম্পর্ক, আইনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আইন সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মারসিলিও কোন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ?
(ক) এয়োদশ শতাব্দী; (খ) চর্তুদশ শতাব্দী;
(গ) পঞ্চদশ শতাব্দী; (ঘ) ষোড়শ শতাব্দী।

২। *ডিফেনসর প্যাসিস* গ্রন্থটি কত সালে রচিত হয়েছিল?
(ক) ১২৭৪; (খ) ১৩১২;
(গ) ১৩২৪; (ঘ) ১৩৪৩।

৩। মারিসিলিও কোন গ্রন্থটিকে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন?
(ক) *ডিফেনসর প্যাসিস;* (খ) *ডিফেনসর মাইনর;*
(গ) *দি রিপাবলিক;* (ঘ) *পলিটিকস্।*

৪। মারসিলিও আইনকে ক'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন?
(ক) ২ টি ; (খ) ৩ টি;
(গ) ৪ টি; (ঘ) ৬ টি।

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে মারসিলিওর অভিমত ব্যাখ্যা করুন।
২। মারসিলিওর আইন ও আইন প্রণেতাতত্ত্ব আলোচনা করুন।